প্রাচীন যমুনা নদীর সন্ধানে

ডঃ তপন কুমার দাস

"গঙ্গা চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতী
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেহস্মিন্ সন্নুধিং করু।"

বাংলার সমভূমি অঞ্চলের যে সকল নদ-নদীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রাচীনত্বের দাবী রাখতে পারে গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতী। তিনটি নদীরই উৎসস্থল চিরতুষারাবৃত হিমালয় পর্বতমালা। তিনটি নদীই যে প্রাচীনতার পূণ্যতোয়া এ সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও লিপিমালা উভয়েই একমত। তিনটি নদীরই তীরবর্তী অঞ্চলে যে সুপ্রাচীনকাল থেকেই সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জনপদের উদ্ভব ঘটেছে তার অজস্র ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্বিক প্রমাণ আজ আমাদের হাতে। আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় প্রাচীনতরা, পুণ্যতোয়া, ইন্দীবর শ্যামা সেই যমুনা-কালিন্দী-কে নিয়ে।

চিরতুষারাবৃত, হিমালয়ের যমুনোত্রী হিমবাহ থেকে যে যমুনা-কালিন্দী নদীর উৎপত্তি, একথা ভারত তথা বাংলার সকল ইতিহাস ও সংস্কৃতিপ্রেমী মাত্রেই জানেন। যমুনোত্রী থেকে যমুনা কুরুক্ষেত্র ও পানিপথের নরহত্যালীলাস্থল দেখতে দেখতে এসে উপস্থিত হয়েছে বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের রাজধানী দিল্লির কাছে দিল্লি ছেড়ে যমুনা মথুরা, বৃন্দাবন, কানপুর কালপী ছুঁয়ে প্রয়াগে এসে গঙ্গা ও সরস্বতীর মিলিত জলধারায় মিশে গেছে। অর্থাৎ প্রাচীন ধর্মীয় জনপদ প্রয়াগ গঙ্গা-যমুনা সরস্বতী মিলস্থল। তাই এই স্থান ইতিহাসে 'ত্রিবেণী' নামে খ্যাত। প্রয়াগ গঙ্গা-যমুনা সরস্বতী একসঙ্গে। একই ধারায় যুক্ত হওয়ায় জন্য এই স্থান 'যুক্তবেনী' নামেও খ্যাত হয়ে আছে। এই যুক্তবেনী অর্থাৎ প্রয়াগের পর যমুনা ও সরস্বতী তার নিজস্ব ধারায় প্রবাহিত না হয়ে গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রবাহপথের সঙ্গে মিশে গেছে। অর্থাৎ গঙ্গা এখান থেকে যমুনা ও সরস্বতীকে সঙ্গে নিয়ে তার প্রবাহপথে প্রবাহিত হয়ে সাগর সঙ্গমের দিকে এগিয়ে চলেছে।

প্রয়াগ ছেড়ে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীকে সঙ্গে নিয়ে বারানসী, গাজীপুর হয়ে এসে পৌঁছেচে বর্তমান বিহারের রাজধানী পাটনা (প্রাচীন পাটলিপুত্র) নগরীতে। পাটনা থেকে গঙ্গা ক্রমশঃ পূর্ব প্রবাহিত হয়ে এসে পৌঁছেচে বিহারের রাজমহল পাহাড়ের কাছে। সেখান থেকে রাজমহলের উত্তর-পশ্চিমে তেলিগড়-সিক্রিগলির সংকীর্ণ গিরিবর্ত দিয়ে প্রবেশ করেছে বাংলা ভূখন্ডে, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে। বাংলার সমতলভূমিতে এসে মালদহ

জেলা স্পর্শ করে; মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবেশ করে; প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ মহানগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখে; চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের প্রশংসাধন্য রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের শ্রীহীন অবস্থা দেখতে দেখতে এসে; নদিয়া জেলা ভেদ করে পৌঁছেচে বর্তমান হুগলি জেলার আর এক স্থান 'ত্রিবেণীতে' এই 'ত্রিবেণীতে' এসে গঙ্গা আর যমুনাও সরস্বতীকে ধরে রাখতে পারেনি। তাই দেখা যাচ্ছে যে এই 'ত্রিবেণী'তে এসে যমুনা ও সরস্বতী, গঙ্গার মূল প্রবাহ থেকে মুক্ত হয়ে পড়েছে। তাই বহু অতীত থেকেই হুগলির এই 'ত্রিবেণী' 'মুক্তবেনী' নামে খ্যাত হয়ে আছে। অর্থাৎ প্রয়াগের ত্রিবেণী যেমন মুক্তবেনী; ঠিক তেমনি হুগলির এই ত্রিবেণী মুক্তবেনী;।

সুদূর অতীতকাল থেকেই গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নদীর মুক্তস্থল এই 'ত্রিবেণী'-র খ্যাতি জগৎজোড়া। ২৩-৭৯ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি রোমের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য প্রসঙ্গে এই 'ত্রিবেণী'-র কথা বলেছেন "the ships assimilating near the godavari sailed from thence to cape palinurus, thence to testing ale opposite fulta, thence to Tribani, and lastly to patna" এই ত্রিবেণী যে যমুনা নদীর মুক্ত স্থল সে আলোচনাও আমরা আগে করেছি। আর এই ত্রিবেণী ছেড়ে (বর্তমান পাটনা বন্দর - নগরী) (প্রাচীন পালীমবথরা)-তে যে রোমান জাহাজের আনা গোনা ছিল তাও জানা গেল। খ্রিস্টিয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত বৃহদ্ধর্ম পুরাণেও আমরা যমুনার নদীর সবিশেষ উল্লেখ পাই। দ্বাদশ শতকে রচিত গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যসপ্তসতী'-র পাতায় যমুনার উল্লেখ, যমুনার খ্যাতি ও যমুনার তীর্থ মহিমা আমাদের বেশ আশ্চর্য করে তোলে। কয়েকটি বিবরণ দেওয়া যাক।

'আর্যসপ্তসতী'-র 'ভ'-কার ব্রজ্যে উল্লেখ আছে যে "ভবতি নিদাঘে দীর্ঘে যথেহ যমুনেব যামিনী তন্মী। দ্বীপা হব দিবসা অপি ক্রমেন প্রার্থীযাংসঃ।" অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে যমুনা স্বল্পতোয়া ও যামিনী ছোট হয়। আবার জল নামিয়া গেলে দ্বীপের আকার বাধিত হয় এবং দিনগুলিও বড় হয়।

'আর্যসপ্তসতী'-র 'য'-কার ব্রজ্যা-য় বলা হয়েছে-

"যা নীয়তে সপত্ন্যা প্রবিশ্য যাবজিতা ভূজঙ্গেন।
যমুনায়া ইব তস্যাঃ সখি মলিনং জীবনং মন্যে।"

যমুনাকে ভূজঙ্গ কালিয় ভোগ করত; কৃষ্ণ কালিয়কে দমন করায় কালিয়, যমুনা নিজে সাগরে যাইতে পারে না। সে গঙ্গার সহিত মিশিয়া সাগর-সঙ্গম লাভ করে।

'আর্যসপ্তসতী'-র 'য'-কার ব্রজ্যায় আরো বলা হয়েছে

যে, - "যমুনা তরঙ্গে তরলং ন কুবলয়ং কুসুমলাবি তব সুলবম্।
যদি সৌরভানুসারী ঝঙ্কারী ভ্রমতি ন ভ্রমরঃ।।" অর্থাৎ ওগো পুষ্পলাবি, পরিমললুব্ধ ঝঙ্কারকারী ভ্রমর যদি সঙ্গে না থাকে তবে যমুনা তরঙ্গে চঞ্চল কুবলং চয়ন করা তোমার পক্ষে কঠিন হইবে।

খ্রিস্টিয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে রচিত, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ'-এও আমরা গঙ্গার সঙ্গে যমুনা নদীর এক প্রাঞ্জল বিবরণ পাই। 'চর্যাপদ'-তো বাংলার জল, মাটি, হাওয়া, বাতাস, নদ-নদী, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সর্বোপরি বাংলার কৃষিজীবী গ্রামীণ সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করেই রচিত। কবি নিজের চোখে দেখে লিখেছেন "গম্ভীর বেগে প্রবাহিত, গঙ্গা-জউনা।" এখানে 'জউনা' বলতে যে কবি যমুনা নদীকেই বুঝিয়েছেন তা নির্দিধায় বলা যায়। অর্থাৎ খ্রিস্টিয় একাদশ-দ্বাদশ শতকেও গঙ্গার মতো যমুনার গতিবেগ যে ভরপুর তা পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যায়।

পাঠান আমলেও যমুনা তার পূর্বের মতো ঐতিহ্য নিয়ে স্ব-মহিমায় আসীনা ছিল বলেই মনে হয়। কারণ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে যে যমুনা নদীর পথে বড় বড় বাণিজ্য তরীর আনাগোনা চলছিল; তখনও যমুনার তীর্থ মহিমা যে অটুট-এর 'মনসামঙ্গল' কাব্যে:

"গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশাল অতি
অধিষ্ঠিত উমা মাহেশ্বরী।।"

শুধু তাই নয়, সপ্তদশ শতকে, মুঘল সম্রাট আকবরের সময়ে যমুনা তীরবর্তী, বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যশোহরের রাজা প্রতাপদিত্য রায়; দিল্লির সম্রাট আকবরের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তার পরিষ্কার বর্ণনা পাওয়া যায় সমসাময়িক আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এবং ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের বর্ণনায়। আকবর সেনাপতি মানসিংহের 'যশোর যাত্রা' প্রসঙ্গে কবি ভারতচন্দ্র তাঁর মানসিংহ কাব্যে বলছেন:—

"যশোর নগর ধাম প্রতাপ-আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাকি আঁটি তার
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।।
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বাহান্ন হাজার যায় ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতি অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী

তাঁর খুড়া মহাকায় আছিল বসন্ত রায়
রাজা তারে সবংশে কাটিল
তার বেটা কচুরায় রানী বাঁচাইল তায়
জাহঙ্গীরে সেই জানাইল।।
ক্রোধহইল পাতশায় বাধিয়া আনিতে তায়
রাজা মানসিংহে পাঠাইলা
বাইশী লসকর সঙ্গে কচুরায় লয়ে রঙ্গে
মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা।।"

মধ্যযুগে বাংলার বারভুঁইয়াদের অন্যতম রাজা প্রতাপ-আদিত্য রায় যে যশোর নগরে তাঁর রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন তা যেমন ঐতিহাসকিভাবে সত্য, তেমনি এই যশোর নগরী যে অধুনা লুপ্তপ্রায়, বাংলার প্রাচীনা নদী যমুনার তীরে গড়ে তুলেছিলেন তাও বোঝা যায় মধ্যযুগে রচিত কবি ভারতচন্দ্রের বর্ণনায়:-

"আগে পাছে দুই পাছে দুসারি লস্কর।
চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর।।
মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া।
কাছে আছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া।
এইরূপে যশোর নগরে উত্তরিয়া।
থানা দিয়া চারদিকে মরুচা করিয়া।
শিষ্টাচার মত আগে দিল সমাচার।
পাঠাইয়া ফরমান বেড়ি তলবার।।
প্রতাপ-আদিত্য রাজা তলবার লয়ে।।
বেড়ি ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল করে।।
কহ গিয়া আরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে।।
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে।।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকেও যে যমুনার গতিপ্রবাহ বাণিজ্যপোযোগী ছিল, যমুনার তীর্থমহিমা যে তখনও মোটামুটি অটুট ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ব্রিটিশ শাসনকালে যমুনার তীরবর্তী অঞ্চলে অসংখ্য জমিদারীর পত্তনে, ব্রিটিশ সাহেবদের স্মৃতি বিজড়িত অসংখ্য স্থান নামের মধ্যে, ব্রিটিশ দলিল-দস্তাবেজে বর্ণিত যমুনার অসংখ্য খেয়াঘাটের

বর্ণনায় এবং প্রত্নকীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখে কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে, কালের প্রকোপে যমুনা তার অতীতের সেই ঐতিহ্য হারিয়ে শুষ্ক শীর্ণ খালের আকারে পড়ে আছে। তবে একেবারে হারিয়ে, বিলীন হয়ে যায় নি। সেই প্রবাহ পথ আজও আছে। তবে সেই প্রবাহ পথ খুঁজে পেতে গেলে হাটাপথ ছাড়া উপায় নাই। যমুনার সেই শীর্ণকায়া শুষ্ক মজাখাত ধরে অগ্রসর হয়ে আজও সেই পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তাই আমরা এখন যমুনার প্রাচীন প্রবাহপথ অনুসন্ধানে অগ্রসর হব।

<u>যমুনা নদীর প্রবাহপথের অনুসন্ধান ঃ</u>

পূর্বেই আমরা দেখেছি যে প্রাচীনতরা নদী যমুনার মুক্তস্থল (মুক্তবেণী) আজকের হুগলি জেলার ঐতিহ্যমন্ডিত, প্রাচীনস্থান ত্রিবেণী। এই ত্রিবেণী-তে এসে যে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী পরস্পর-পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্ব স্ব প্রবাহপথে, নিজ নিজ খাতে প্রবাহিত হয়েছে তাও আমরা দেখেছি। কিন্তু ত্রিবেণী থেকে যমুনা মুক্ত হয়ে গেছে কোথায়, কোন পথে, কিভাবে। এ সম্পর্কে প্রাচীন বর্ণনাতো প্রায় নেই বললেই চলে, এমন কি মধ্যযুগের সাহিত্য ও ঐতিহাসিক বর্ণনাতেও খুব একটা নেই। দুঃখের বিষয় বর্তমানকালের অনেক লেখক-গবেষকের আলোচনায় বাংলার নদ-নদীর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ক্ষেত্রানুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত তথ্য যে তাদের আলোচনায়, গবেষণায়, বক্তৃতায় অনুপস্থিত থেকে গেছে তা আমি নির্দিধায় বলতে পারি।

তাই মুক্তস্থল অর্থাৎ ত্রিবেণী (মুক্তবেনী) থেকে যমুনার মজা খাত ধরে, হাঁটাপথে, সরেজমিনে ক্ষেত্রানুসন্ধান ছাড়া যমুনা নদীর প্রবাহপথ অনুসন্ধান করা, সম্ভব নয়। আবার শুধু সরেজমিনে ক্ষেত্রানুসন্ধান-ই নয়, নদী তীরবর্তী দুই অঞ্চলের প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর, সাহায্যে নদীর গতিপথের প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করাও কর্তব্য। তাই ত্রিবেণী থেকে যমুনার প্রবাহপথ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এবং যমুনার বর্তমান প্রবাহপথের দুই তীরবর্তী অঞ্চলে যে সমস্ত প্রত্নদ্রব্য পাওয়া গেছে সেগুলি গবেষণা করে; বর্তমান প্রবাহ পথই যে যমুনার প্রাচীনতমা এবং একমাত্র পথ তা বলা যায় না। খ্রিস্টিয় একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে কোন এক বড় ধরনের প্রাকৃতিক কারণে বাংলার নদ-নদী গুলো যে একবার প্রবাহ পথ পরিবর্তন করেছিল তা নিশ্চিত করেই বলা চলে। অবশ্য সেই প্রবাহ পথ কোন বিশেষ স্থান থেকে একেবারে মোহনা পর্যন্তও হতে পারে; আবার মধ্যবর্তী অংশের কোন স্থান বিশেষেও হতে পারে। আমার মনে হয়েছে যে, ত্রিবেণী থেকে একেবারে সাগর সঙ্গম পর্যন্ত এই দীর্ঘ প্রবাহপথের মধ্যে যমুনা এক বা একাধিকবার তার প্রবাহ পথ পরিবর্তন করেছে। যমুনা নদীর বর্তমান প্রবাহপথের তীরবর্তী ভূখন্ড ধরে হাঁটাপথে পর্যবেক্ষণ

করে আমার মনে হয়েছে যে যমুনা প্রাচীনকালে প্রবাহিত হতো আরো পশ্চিম ঘেঁষে। পাল-সেন পর্বে অর্থাৎ খ্রিস্টিয় দশম-দ্বাদশ শতকের মধ্যে যমুনা তার প্রাচীন প্রবাহপথ ছেড়ে বর্তমান প্রবাহপথে প্রবাহিত হতে থাকে। কারণ বর্তমান যমুনা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু এবং ঐতিহাসিক উপাদান সেরকমই ইঙ্গিত দেয়। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে সেই সুপ্রাচীন প্রবাহপথটি গেল কোথায়? এমনও হতে পারে যে যমুনার প্রাচীন পথটি হেজে-মজে-বুজে হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; আর নয়ত অন্য কোন নামে আজও টিকে আছে। তবে সেপথও যে খুঁজে পাওয়া কঠিন এমন নয়; অবশ্যই সেপথ খুঁজে পাওয়া, একদিকে যেমন সময়বহুল তেমনি ব্যয়বহুলও বটে। আর সেই সঙ্গে প্রয়োজন নিষ্ঠাবান, ধৈর্যশীল কষ্টসহিষ্ণু গবেষক ও ক্ষেত্রানুসন্ধানীর। বাংলার অন্যান্য নদ-নদী প্রবাহপথ সন্ধানের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যমুনার সেই প্রাচীন প্রবাহ পথ আজও খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে। যতই সেই সমস্ত প্রত্নস্থলের আশেপাশে প্রবাহিত নদ-নদী বা বর্তমান গতিবিধি অনুসরণ করলে যমুনার উৎস ও মোহনা খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর হবে। তবে যে খাল, যে নালা, বা যে নদীই হোক তার উৎসস্থল যদি হয় আজকের ত্রিবেণী; সেই খাল, নালা বা নদীই হবে প্রাচীন যমুনা। কারণ ত্রিবেণী গতি প্রাচীনস্থল। ত্রিবেণীর খ্যাতিই গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর খ্যাতি। ত্রিবেণী গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতী ছাড়া অন্য কোন নদীকে চেনে না। চেনার প্রয়োজনও ত্রিবেণীর নেই। সে প্রয়োজন প্রাচীনকালেও ছিল না, আজও নেই। যদি ভবিষ্যতে কখনও যমুনা নদীর প্রাচীনতর প্রবাহপথটিকে আবিষ্কার করা যায়; যদি কখনও সময় ও সুযোগ আসে; তাহলে ভবিষ্যতেই যমুনা নদীর প্রাচীন প্রবাহপথের ইতিহাস আলোচিত হবে। সেই আশায় থেকে আমরা বর্তমানকালের যমুনা নদীর প্রবাহপথটিকেই আবিষ্কার করার চেষ্টা করব।

পূর্বেই বলেছি বর্তমান হুগলি জেলার ত্রিবেণী যমুনা নদীর মুক্তস্থল। এই ত্রিবেণী থেকে যমুনা নদী; ভাগীরথী (গঙ্গা) ও সরস্বতী থেকে মুক্ত হয়ে; পশ্চিমে বেঁকে নদিয়া জেলার কাঞ্চনপল্লী হয়ে; নদিয়ার দক্ষিণ অংশ ভেদ করে; উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বীজপুর ছুঁয়ে; খালপার পাড়া ভেদ করে; উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন ভেদ করে; নদিয়া জেলার কল্যানী হয়ে; দক্ষিণ-পূর্বে বাঁক নিয়ে; উত্তরে নদীয়া জেলা এবং দক্ষিণে উত্তর ২৪ পরগনাকে রেখে; দুই জেলার সীমানায় রচনা করে; নদিয়া জেলার প্রবেশ করে; উত্তর-পশ্চিমে বাঁক নিয়ে গোকুলপুর, কাটাগঞ্জ, বেদীভবন, ঝিলেরপাড়, চাঁদমারী হয়ে, কুলিয়ার পাট দর্শন দিয়ে; পুনরায় উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে; গয়েশপুরের পাশ দিয়ে; পূর্বে বাঁক নিয়ে মদনপুর হয়ে; চন্ডিরামপুর, বিরহী, রায়পাড়া, চড়কতলা, নীলকুঠি, ভোগের পাড়া হয়ে; মগরার সাহেব বাগান ছুঁয়ে উত্তর-পূর্বে বাঁক

নিয়ে; হরিণঘাটা ছুঁয়ে পুনরায় দক্ষিশ-পূর্বে বাঁক নিয়ে অগ্রসর হয়ে; বিশাল এক অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ সৃষ্টি করে; বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনার নিশিবেড়িয়া, হিংলী, ময়ালডাঙ্গা, তিনথাই হয়ে গাইঘাটা বাসস্ট্যান্ডের পশ্চিমপ্রান্ত ঘেঁসে; পূর্বে আমকোলা, মেটেগাছি, নাইগাছি, মল্লিকপুর, বেলিনী, ঘোষপুর, লক্ষ্মীপুর, নকফুল হয়ে আজকের গোবরডাঙ্গা শহরের পশ্চিমপ্রান্ত ঘেঁষে; ক্রমশ দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে কানাইনাটশাল, খাটুরা, উত্তরপাড়া, সরকারপাড়া, ঘোষপুর, চারঘাট, ঘোলা হয়ে এসে পৌঁছেচে আজকের টিপি জনপদে।

এই টিপির কাছে এসে যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে আর এক নদী, যার নাম ইছামতী। এই টিপির কাছ থেকে শুরু করে, বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বসন্তপুর পর্যন্ত এই দুই নদীর, মিলিত প্রবাহপথের নাম সাধারণভাবে ইছামতি নামে পরিচিত হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে ইছামতী কোন প্রাচীন নদী নয়। ইছামতী একটি অর্বাচীন নদী। ইছামতী যমুনারই উপনদী। কারণ প্রাচীন কোন সাহিত্যে, কাব্যে, ধর্মগ্রন্থে ইছমতীর মহিমা প্রচারিত হয়নি। ইছমতীর গুণকীর্তনও শোনা যায় নি। অর্থাৎ নদী বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, ইচ্ছামতী, যমুনার একটা উপনদী মাত্র। যমুনার প্রাচীনতমা, পুণ্যতোয়া নদী। যমুনার গুণকীর্তন যুগ-যুগ অতিক্রান্ত হয়ে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মধ্যযুগ হয়ে একেবারে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক পর্যটন এই সুদীর্ঘ সময়ে অসংখ্য কাব্যে, সাহিত্যে, ধর্মগ্রন্থে বিবৃত হয়ে আছে।

টিপি থেকে যমুনা ও ইছামতীর যুক্ত প্রবাহ ধারা বসন্তপুর পর্যন্ত ইছামতী নামে পরিচিত হলেও; দেখা যাচ্ছে; বসন্তপুর থেকে ধুমঘাট পর্যন্ত এই একই প্রবাহের নাম কিন্তু যমুনা! অর্থাৎ যমুনা যমুনাই। যমুনার স্মৃতি যুগ যুগ অতিক্রান্ত হলেও জনসাধারণের মন থেকে মুছে যায় নি। সে আজও জেগে আছে। জেগে আছে লোক সাহিত্যে, লোকগীতিতে, লোককথায়। যাই হোক টিপির মোহনা থেকে যমুনা ইছামতীকে সঙ্গে নিয়ে তরণীপুর, শ্রীনাথপুর হয়ে স্বরূপনগর স্পর্শ করে; বাকুরিয়া থানা এলাকায় প্রবেশ করে কবিলপুর ও হাকিমপুর খেয়াঘাট ছুঁয়ে, নবস্তিয়া ও মুদিয়া হয়ে বাইকাটির পাশ দিয়ে বসিরহাট থানা এলাকার প্রবেশ করে বাজিতপুর, হরিশপুর ছেড়ে ইটিন্ডার পশ্চিম ঘেঁষে নলকোরার পূর্বদিকে দিয়ে অগ্রসর হয়ে; ভারত ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সীমানা রচনা করে গোয়ালহাটিকে পূর্বে রেখে টাকি শহরের পূর্বপ্রান্ত ঘেঁষে (পূর্বে বাংলাদেশের শ্রীপুর) হাসনাবাদ, ভবানাপুর ও রায়ভবানীপুর ছেড়ে (পূর্বে বাংলাদেশের দেবহাটা) ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্বে বেঁকে বুড়নহাটি হয়ে কালীগন্ডের কাছে এসে যমুনা পুনরায় দুটিভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এর একটি শাখা দক্ষিণ-পূর্ববাহী হয়েছে; যার নাম যমুনা। আর একটি শাখা দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে, যার নাম কালিন্দী (যমুনার আর নাম কালিন্দী) এখান

থেকে কালিন্দী ক্রমশ দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে বঙ্গালপাড়া, নরনগর প্রভৃতি স্থান ছুঁয়ে সুন্দরবনের গহন অরণ্যে প্রবেশ করে বঙ্গোপসাগরে বিলীন হয়ে গেছে।

পূর্বেই দেখেছি যে যমুনা ইছামতীকে সঙ্গে নিয়ে কালীগঞ্জ থেকে দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রসর হয়েছে। কালীগঞ্জের কিছুটা দক্ষিণ এসে যমুনা শীতলপুরকে পশ্চিমে রেখে, দক্ষিণ-পূর্বে বাঁক নিয়ে; পশ্চিমে মুকুন্দপুর ও পূর্বে গররাজপুরকে রেখে আরও দক্ষিণে, অগ্রসর হয়ে পূর্বে মাতলা, জাহাজঘাটা, নকীবপুর, খাগড়াঘাট এবং পশ্চিমে দুধাল, গোপালপুর এবং মামুদপুর রেখে, আরও কিছুটা দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে বংশীপুরের উত্তরে এসে পুনরায় ইচ্ছামতীকে যুক্ত করেছে। এখান থেকে যমুনা দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রসর হয়ে ধূমঘাটকে পশ্চিমে রেখে ক্রমশঃ দক্ষিণবাহী হয়ে সুন্দরবনে প্রবেশ করে বঙ্গোপসাগরে মিশে গেছে। আর ইচ্ছামতী ও যমুনা থেকে বিমুক্ত হয়ে কদমতলী নদী নাম নিয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে মিশে গেছে।